প্র | ব | ন্ধ

নিজেদেরকে তাহলে কি নামে ডাকি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এই লেখাটা লিখতে গিয়ে একজনের কথা খুব করে মনে পড়ছে, তিনি হচ্ছেন শামসুর রাহমান। আজ তিনি নেই, থাকলে এই যে ঈদ সংখ্যা প্রকাশের নানা আয়োজন তাদের কয়েকটিতে অবশ্যই লিখতেন, তাঁর কবিতা থাকতো প্রথমে, তারপরে অন্য লেখার থাকা না-থাকা। শামসুর রাহমান নেই, কিন্তু তাই বলে তিনি যে অনুপস্থিত হয়ে যাবেন তা নয়; তিনি থাকবেন, তাঁর রচনা থাকবে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির যে-ধারার ভেতরে থেকে তিনি লিখতেন সেটাও অবশ্যই থাকবে। ওই ধারা যতই শক্তিশালী হবে শামসুর রাহমানের রচনাও ততই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

যে-ধারাটির কথা বলছিলাম সেটিও মূল ধারা। আত্মপরিচয়ের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেবল যে মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে তা নয়, এই জনপদের মানুষের জন্যও। মধ্যবিত্ত বাঙালির রুচি গঠনে সাহিত্যের একটা ভূমিকা সব সময়েই ছিল ; রুচি গঠনের ব্যাপারে শামসুর রাহমান বিরতিবিহীনভাবে কাজ করেছেন। সেই যে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সসঙ্কোচ পদার্পণ, তার পর থেকে নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকের এই সময়টা পর্যন্ত একবারও থামেননি, একটুও পেছোননি। বরঞ্চ নিজের মতো করে' শান্ত দৃঢ়তায়, এগিয়ে গেছেন। প্রতিপক্ষ ছিল। প্রবলভাবেই। সেটি যেমন সামাজিক, তেমনি রাজনৈতিকও। সমাজ সাহিত্যচর্চাকে মূল্য দিতে অভ্যস্ত ছিল না, এখনো যে হয়েছে তা নয়। কিন্তু সমাজের বৈরিতার চেয়েও অধিক কার্যকর ছিল রাষ্ট্রীয় অপক্ষপাত। রাষ্ট্রের হাতে নিয়ন্ত্রণ ছিল সব কিছুর, বিশেষভাবে গণমাধ্যমের।

শামসুর রাহমান যে-ধারার প্রতিনিধি চূড়ান্ত বিচারে সেটি দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক। বিপরীত ধারাটি দেশপ্রেমের ভান করতো, বড়াই করতো ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু দেশপ্রেমিক তো নয়ই, আসলে সে ছিল দেশদ্রোহী। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে এইখানে যে সে ছিল অগণতান্ত্রিক; নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোকে সবেগে উপেক্ষা ও সুযোগ পেলেই সবিক্রমে পদদলিত করতো। সমাজকে সে ঠেলতে চাইতো পেছন দিকে, মানুষকে রাখতে চাইতো পাশ্চাৎপদ করে। দুটি ধারা পাশাপাশি ছিল, কিন্তু তাই বলে তাদের ভেতর অবস্থানটা যে সহ-অবস্থানের ছিল তা নয়, দুয়ের ভেতর স্নায়ুযুদ্ধ যে ঘটবে সেটাও সম্ভব হয়নি। কেননা জনবিদ্বেষী যে-ধারাটি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাচ্ছিল সেটা উদারনৈতিক ধারাকে সহ্য করতে পারেনি, তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল তার অভিপ্রায়; তার নিজের অস্তিত্বের অন্যতম শর্তও ছিল ওই নিশ্চিহ্নকরণ।

এক কথায় বলতে গেলে দেশদ্রোহী অগণতান্ত্রিকতার উৎস প্রোথিত ছিল কায়েমী স্বার্থে। পাকিস্তান এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সেখানে বাংলার মুসলমান কৃষক হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে মুক্তি পাবে, আর মুসলমানদের ভেতর যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি গড়ে উঠছিল সেই শ্রেণীর আশা ছিল হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বিরা না থাকায় লক লক করে বেড়ে উঠবে। মধ্যবিত্তই ছিল পরিচালক, তারা নিজেদের স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আশা বুকে নিয়েই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একজনের খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বেশ জীবন্ত একটি ছবি আছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসে যেটি তিনি রচনা শুরু করেন ১৯৪৭ সালেই অর্থাৎ পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই সময়েই। উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই ওই শ্রেণী-প্রতিনিধিটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। লোকটি সরকারি কর্মচারী, মফস্বলে এসে বের হয়েছে শিকার করতে। হাতে বন্দুক, পায়ে বুট, গায়ে বিদেশী পোশাক, মুখমন্ডলও মসৃণ। 'কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলসপরা নব্যশিক্ষিত মুসলমান।'

> **বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দুর্নীতির বলয় থেকে অনেক দূরে। শাসকশ্রেণী নিজেরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পরস্পর থেকে এবং জনগণের মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে পারস্পরিক বিভেদ তৈরি করে দিচ্ছে। ধর্মীয় জঙ্গিবাদের যে উৎপাত তার জন্যও শাসকশ্রেণীই দায়ী**

উপন্যাসের নায়ক ধর্মব্যবসায়ী মজিদ তার ব্যবসার ক্ষেত্র মহব্বত নগরের সন্ধানটা পায় এই খোলসপরা সরকারি কর্মচারীর কাছেই। দুজনের ভেতর পার্থক্য যাকে বলে আকাশ-পাতালের। একজন উচ্চশিক্ষিত, প্রায় সাহেব, অন্যজন প্রায়-অশিক্ষিত, জীবিকার তাড়নায় চালিত, সাজসজ্জা সাধারণ কাঠ মোল্লার। কিন্তু ভেতরে দেখা যাচ্ছে ঐক্য রয়েছে; দুজনের জন্যই ধর্ম একটি আশ্রয়স্থল, নতুন রাষ্ট্রে দুজনেরই সুবিধা হবে, মজিদ সরাসরি লিপ্ত হবে ধর্মব্যবসাতে, এবং সরকারি কর্মচারীটি রাষ্ট্রের সেবা করবেন, রাষ্ট্রের যা কাজকর্ম অর্থাৎ ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে দৃঢ় করা সে-সবের প্রতি সমর্থন জানাবেন। নিজের গ্রামে যদি তিনি একটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করেন তবে তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকবে না। ঐ কাজ না-করাটাই বরঞ্চ মনে হবে ব্যতিক্রম। সরকারি বেসরকারি উভয় ব্যক্তিই আনুকূল্য পাবেন রাষ্ট্রের। কেননা রাষ্ট্র চাইবে ধর্মকে ব্যবহার

করতে। রাষ্ট্র মানুষের পেটের ক্ষুধা মেটাতে না-পেরে আত্মার ক্ষুধাবৃদ্ধি ও তা মেটানোর বন্দোবস্ত করতে থাকবে; ধর্মের কথা বলে চাইবে লোকে যাতে জগতের কথা ভুলে সেটা নিশ্চিত করতে এবং চোখে থাকবে ধর্মের নাম করে লোকের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের দিকে। রাষ্ট্র, খোলসপরা অনগ্রসর সরকারি কর্মচারী এবং নিম্নস্তরের ধর্মব্যবসায়ী- তিনপক্ষ এক হয়ে যাবে নিজেদের প্রশ্নে। পেছনে থাকবে পুঁজিবাদী বিশ্ব, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা চাইবে নতুন রাষ্ট্রটি তাদের তাঁবেদার হয়ে থাক। তাঁবেদার হওয়ার পথে সেকালে প্রধান অন্তরায় ছিল বামপন্থীরা, তাদের নিধনে পুঁজিবাদী প্রভুরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে নিরন্তর উৎসাহ দেবে তাও ছিল অনিবার্য।

সেটাই ঘটেছে। তিনটি স্বদেশী এবং একটি বিদেশী, এই চার শক্তি এক হয়ে গিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে, এবং তাদের ওপর নানা ধরনের নিষ্পেষণ চালিয়েছে। পীড়নের একটি ক্ষেত্র ছিল ভাষা। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অভিসন্ধি ছিল পূর্ববঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নেবে এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে বাঙালিদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করবে। সে ষড়যন্ত্র যখন বিফল হলো তখন তারা লিপ্ত হয়েছে বাংলা ভাষার ওপর নানাবিধ হস্তক্ষেপে। সে-কাহিনী বড়ই গ্লানিকর। বিশেষ করে এই জন্য যে, তার সঙ্গে খোলসপরা স্থানীয় লেখকেরাও যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রস্তাব উঠেছিল রোমান হরফ প্রবর্তনের, সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব করেছে বর্ণসংস্কারের, সাড়া পাওয়া যায়নি। নজরুলকে সংশোধন করতে চেয়েছে, লোকে তাতে বিরূপ হয়েছে। চেষ্টা চলেছে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের, শোনামাত্র প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। বাঙালির যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য তাকে খণ্ডিত ও বিকৃত করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারাকে ঐতিহ্য হিসাবে দাঁড় করাবার কাজটাও চলছিল। মুসলিম মানস, মুসলিম চেতনা এসব নিয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আইরিশ সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র এই রকমের তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে পূর্ববঙ্গের জন্য আলাদা সাহিত্য চাই বলে আওয়াজ ওঠেছে। ঐতিহ্যের প্রশ্নে স্বামী হিসাবে টিএস এলিয়টকে দাঁড় করিয়ে ভাষার চেয়ে ধর্ম শক্তিশালী এই ধরনের মনগড়া কথা সেকালে আমরা তথাকথিত বিজ্ঞ মহল থেকে শুনতাম। কেউ কেউ আবার বলতেন বাংলা সাহিত্যের 'হিন্দু' অংশকে সম্পূর্ণ বর্জন করার দরকার নেই, তবে সেই অংশটাই গ্রহণযোগ্য হবে যেটি মুসলিম ধারার বিকাশকে সাহায্য করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাহিত্যের ভাষা কেমন হওয়া উচিত তার বাস্তবিক নিদর্শনও উপস্থিত করা হচ্ছিল। পুঁথির ভাষাকে ব্যবহার করে, ঘাস ফড়িং ফাল দেয় খেতের আইলে জাতীয় পঙ্‌ক্তি রচনা করা হয়েছিল সনেটের নাম দিয়ে। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একজন নেতা, আন্দোলনের কারণে তিনি কারাভোগ করেছেন, পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা তাঁরই রচনা, কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে তিনিও ছিলেন বেশ অনমনীয়, একেবারেই স্থানীয় বাগবিধির সঙ্গে সাধুভাষায় প্রচলিত শব্দ, এমনকি ইংরেজি শব্দাবলী যুক্ত করে গুরুচণ্ডালী তৈরিতে তার আপত্তি তো নয়ই, বরঞ্চ আগ্রহই ছিল। গুরুচণ্ডালী জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও পাওয়া যাবে, কিন্তু সেখানে তারা এসেছে নন্দাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে, কবিতার অংশ হিসাবে, নিয়ম নয় ব্যতিক্রম হয়ে, আর আবুল মনসুর আহমদ যা চাচ্ছেন তা হলো এই মিশ্রণকেই নিয়ম করতে, একই মানে গদ্যভাষা হিসাবে চালু করাই ছিল তাঁর প্রকল্প। কৌতুকের লেখক এখানে তাঁর কৌতুকবোধকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন; পাক-বাংলার স্বতন্ত্র কালচারের বাতিক তাঁকেও পেয়ে বসেছিল।

উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক এবং সমষ্টিগত শুভবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত ধারাটিকে রাষ্ট্রানুগৃহীত এই আগ্রাসী ধারাটির আক্রমণ সহ্য করে টিকে থাকতে এবং এগিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষই উদারনৈতিক ধারার সঙ্গে ছিলেন, যে জন্য এটি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে পেরেছে। উর্দুর বিরুদ্ধে বাংলাভাষাকে ছাত্র-জনতা রক্ষা করেছে, ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছেন সাহিত্যসেবীরা। যাঁদের মধ্যে শামসুর রাহমান ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর কবিতায় বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের অকৃপণ ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি আছে স্থানীয় শব্দ ও বাগবিধির দক্ষ প্রয়োগ। বিশ্বসাহিত্য থেকে তিনি উপমা ও প্রতীক গ্রহণ করেছেন। বর্জনবাদিতার দোষ তাঁকে যেমন আক্রমণ করতে পারেনি, তেমনি কাণ্ডজ্ঞানও ছিল তার প্রখর। উদারপন্থী ধারায় তাঁর আগে ও পরে অনেকেই কবিতা লিখেছেন, ধারাটি তাদের রচনাকে ধারণ করে ধনী হয়েছে, কিন্তু শামসুর রাহমান যে-ভাবে কখনো কোনো বিরতি না নিয়ে, এবং নন্দনতাত্ত্বিক সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন অন্য কেউ সেভাবে এগুতে পারেননি। অন্যদের মতো হয়েও তিনি ছিলেন একান্তই নিজের মতো, তাঁর ভাষা যেমন তাঁর অনুভবগুলোও তেমনি ছিল তাঁর নিজস্ব, মহৎমাপের লেখকদের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটে থাকে।

২.

নিষ্পেষণকারী পাকিস্তানি রাষ্ট্র শিল্পী-সাহিত্যিকদের আশ্রয়দানে উৎসাহী ছিল না। ১৯৪৭-এ কলকাতায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত এমন শিল্পী ও সাহিত্যসেবীরা যখন ঢাকায় এলেন তাঁদের জন্য সমস্যা ছিল চাকরির; এবং বাসস্থানের দুটোরই। জসীমউদ্‌দীন এবং আব্বাসউদ্‌দীন আহমদ চাকরি পেয়েছিলেন প্রচার দপ্তরে, তাদের তুলনায় অন্যরা বেশ কষ্টে ছিলেন। সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দীন আহমদ, শেখ লুৎফর রহমান- এঁরা থাকতেন মেস করে পুরাতন ঢাকার জিন্দাবাহার লেনে। ফররুখ আহমদ ছিলেন পাকিস্তানে নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণ আনয়নে বিশ্বাসী কবি, কিন্তু রাষ্ট্র তাঁকে প্রশ্রয় দেয়নি। রেডিও পাকিস্তানে তাঁর চাকরিটির নাম ছিল স্ক্রিপ্ট রাইটারের, কাজ ছিল ছোটদের আসর পরিচালনা করা। তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হয়েছে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ছিল কবি শাহাদাৎ হোসেনের অবস্থা। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে কবি। নাটকও লিখেছেন, অভিনয়ও করেছেন নাটকে। কলকাতাতেই তিনি কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; ঢাকায় এসে বিপদে পড়েছিলেন, উৎপাটিত মানুষেরা যেমন পড়ে। তাঁর কবিতাতে একটি পৌরুষদীপ্ত কল্পলোক থাকতো, 'মসনদের মোহ' নামে তাঁর একটি নাটক আছে, তাঁর নিজেরও মোহ ছিল, বিশেষভাবে স্বাধীনতার। যৌবনে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, পরে জেল খেটেছেন, চব্বিশ পরগনার লোক, কলকাতা ছিল কর্মক্ষেত্র, সেই কলকাতাকে পেছনে রেখে যখন ঢাকায় এলেন তখন তাঁর বয়স ৪৬ বছর। চাকরি একটা পেয়েছিলেন রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রিকা ছিল একটি, নাম 'এলান', অবাঙালি নামে বাংলা পত্রিকা, শাহাদাৎ হোসেনকে তার সম্পাদক করা হয়েছিল। সে চাকরি স্থায়ী হয়নি, ১৯৫৩তে তিনি চাকরি হারান। পাকিস্তান মানুষের মুক্তি দেবে এ-আশা তাঁরও ছিল, কুলমখলুক জিন্দা পাকিস্তানের বন্দনা গান করছে এমন পঙ্‌ক্তি তাঁর কবিতাতেও পাওয়া যাবে, কিন্তু পাকিস্তানে তো তিনি থাকবার মতো জায়গা পেলেন না। অকৃতদার নিঃসঙ্গ অবলম্বনহীন কবি ১৯৫৩ সালেই ফিরে যান চব্বিশ পরগনাতে, নিজের গ্রামে। সেখানেও নিশ্চয়ই আশ্রয় পাননি, মারা গেলেন ওই বছরই, গ্রামে নয় কলকাতায়। তাঁকে স্মরণ করে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রেডিও পাকিস্তানের তৎকালীন দপ্তর নাজিমুদ্দিন রোডের ভবনের সামনে। অল্পবয়সী আমিও তাতে উপস্থিত ছিলাম, শেষ প্রান্তে বসে বক্তাদের বক্তব্য শুনছিলাম। কেউ কেউ বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেললেন; কবির প্রতি অবজ্ঞা, অনাদরের কথা স্মরণ করে। স্মরণসভা শোকসভাতে পরিণত হয়েছিল। উপমাটা কেউ ব্যবহার করেছিলেন কি না জানি না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অকৃতদার পরিজনহীন কবি ছিলেন নীড়সন্ধানী পাখির মতো পরিবেশ বৈরী দেখে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এলেন, ঢাকাকে যখন দেখলেন সমান বৈরী তখন রওনা দিলেন নিজের গ্রামের দিকে, তারপর আর নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না, ভেঙে পড়লেন।

সে-কালে কোনো কোনো সাহিত্যিক অবশ্য জাগতিকভাবে সুখে ছিলেন, কিন্তু সে জন্য তাদেরকে যে মূল্য দিতে হয়েছে সেটা কঠিন। নাম ধরেই বলা যায়। যেমন বেনজীর আহমদ। যৌবনে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, একবার গ্রেপ্তার হন, তখন পুলিশের লঞ্চ থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, তার কবিতায় মুক্তির জন্য আকুতিটা বড়ই তীব্রভাবে থাকতো। পরে তিনি আপোস করেছিলেন আইয়ুব খানের সরকারের সঙ্গে, ফলে বড় রকমের সম্পত্তি তাঁর হয়েছিল, কিন্তু কবিতা গেছে হারিয়ে। ফররুখ আহমদ নিজে পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর পাকিস্তান যেহেতু ওই রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তাই তিনি রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহ লাভ